ঈদ সংকলন মার্চ-২০২২
ওয়াতান
সালামুন আলা নুহেন ফিল আলামীন
সালামুন আলা ঈশা ইবনে মরিয়ম
"তোমরা যেন সেই লোকেদের
মতো না হও যাহারা বিভিন্ন
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে
এবং স্পষ্ট নির্দেশ (বিধান)
পাওয়ার পরও মতো বিরোধে
লিপ্ত হইয়াছে যাহারা এই রূপ আচরণ
অবলম্বন করিয়াছে তাহারা
সেই দিন কঠোর শাস্তি ভোগ
করিতে বাধ্য হইবে।"
- আল ইমরান ১০৫।
কান্ডারী আহমদ তরীভরা পাথেয়
নহে এরা শঙ্কিত বজ্রনিপাতেও।
কান্ডারী-এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লাহ
দাঁড়ি মুখে সারিগান লা-শরীক আল্লাহ।

সূ চী প ত্র

ঈদ সংকলন

মার্চ - ২০২২

সম্পাদক
আব্দুল কাদীর মোল্লা

প্রকাশক
আব্দুল মোমিন

প্রকাশিত
সাঁকরাইল, হাওড়া

বিজ্ঞাপনে
নাসিম হাসান

প্রচ্ছদ ভাবনা
আব্দুস সামাদ

যোগাযোগ
৯১২৩৬৩৮৬৯২

অক্ষর বিন্যাসে
দত্ত প্রিন্ট কর্ণার
9903411797

হাদিয়া - ৩৫/-

ওয়াতান

সম্পাদকীয়

ওয়াতানের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি মানুষের ভালবাসা সহজাত। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন স্বদেশ হলো এক জাহাজের মতো। যাত্রীরা তাতে উপর নীচে করে থাকে কিন্তু উপরের লোকেরা যদি নীচের লোকেদের প্রয়োজনীয় পানি নিতে উপরে উঠতে না দেয় তাহলে তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে জাহাজের পাটাতন লিক করে পানি তুলতে গিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে ফেলবে। তাতে উপরের লোকেদেরও সলিল সমাধি হবে। তাই এলিটদের হ্যাভনটদের প্রতি সাম্য ও সুবিচার মূলক নীতি, সহানুভূতি মূলক নীতি অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার দাবী।

ওয়াতান ও ওয়াতানবাসীদের জন্য এর থেকে সুন্দরতর কথা কিছু হতে পারে না। 'অ্যায় মেরে ওয়াতানকে লোগোঁ' বলে সুরেলা কণ্ঠে যখন লতামঙ্গেশকর গান ধরেছিলেন তখন নাকি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর চোখ পানিতে ভরে গিয়ে ছিল। আঁখমে ভর লো পানি'– এই মন্ত্র দিয়েছিলেন। সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারার কবি আল্লামা ইকবাল এদেশের জন্য অনেক কেঁদেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন তাঁর কান্নায় অশ্রুস্নাত এই দেশ। তীর্থংকর বা নবী বুদ্ধের দেশে তিন দিকে পানি। পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে বঙ্গপোসাগর, পূর্বেও সাগর। নদীর ধারে বাস তাই ভাবনা বারোমাস হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কথিত এই দুর্ভাগাদেশে বারোমাসে তের পার্বনই নয় সব সময়ই এখানে রঙ্গ ও মেলা এবং খেলা, সুর ও সাকীর প্রাধান্য। কাব্য-মহাকাব্য নিয়ে গতানুগতিক জীবনযাপন।

ইকবাল নেহেরুকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন বর্ণবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারেনা। মিঃ নেহেরু কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি বর্ণগত, বংশগত, পরিবারতন্ত্র কায়েম করার জন্য কাজ করেছেন। দেশকে দিয়ে গেছেন এ্যাশ (ছাই), কন্যাকে দিয়ে গেছেন ক্যাস আর জনগণকে দিয়ে গেছেন গ্যাস। শুধু সোনার ভারতের স্বপ্ন দেখানো ছাড়া কেউ কিছু করেনি। শুধু ভাঁড়ামী আর ভণ্ডামি। আজও সেই ট্রাডিশান সমানে চলছে। শুধু বাগাড়ম্বর, সারাদেশ তো মড়া কান্নার দেশে পরিণত হয়েছে। দেশ তো সুদে ও ব্যাদে দেউলিয়া হয়ে গেছে। এখানে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনতার অমৃতোৎসব পালিত হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে স্বাধীনতার শতবর্ষে এ দেশ ফুল, ফল, পুষ্পে পুষ্পিত হবে। তখন তো এ প্রজন্মই খতম হয়ে যাবে শুধু প্রতারণা আর ধোঁকাবাজিতে। বুকের ভিতর ছ-পাই-ন-পাই জি.এস.টি দাজ্জালী কর ব্যবস্থা যা ধনীকে ধনী, গরীবকে আরও

গরীব গৃহহীন, অন্নহীন, শিক্ষাহীন ও দুর্বলকে স্বাধীনতাহীন করবে। আসমানে সরকার যদি দয়া না করেন এ দেশ আভ্যন্তরীন কলহ কন্দলে ডুবে যাবে। এদেশের জন্য দরকার Human Brotherhood যার কথা দেশ বিদেশের তীর্থংকর নবী পয়গম্বররা বলে গিয়েছিলেন।

দেশ যাতে ধ্বংস হয়ে না যায় সেজন্য তারা অসারনাথদের বাদদিয়ে সারনাথের জন্য কাজ করেছেন ধৈর্য ও ত্যাগ-কোরবানির মাধ্যমে। আজ আমাদের একাজ করতে হবে 'সত্যমেব জয়তে'র সাথে যদি সততা না থাকে তাহলে কিছুই হবে না। সত্য-সততা ও সদ্ধর্ম ছাড়া শঠে শাঠ্যেং সমাচারেতের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ম্যাকিয়াভেলীর রাজনীতি আমাদের ডোবাবে। দেশ মগের মুলুক হয়ে যাবে। বন্যা-ভূমিকম্প, সাইক্লোন, ভূমিধ্বস মার্কিন মুলুকের মতো আমাদেরও ঘিরে ধরবে। ড্রোন বেঁচে এর সমাধান নেই। বিজ্ঞান মানুষ মারার যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। বুদ্ধের দেশ আজ শান্তি উপহার না দিয়ে অস্ত্র উপহার দিচ্ছে। এতো দেশবৈরী কাজ। May God Save the Countrymen.

দারসে কোরান

দুখান বা দুঃখদৈন্য

দুখানের শব্দগত অর্থ ধোঁয়া কিন্তু ভাবগত অর্থ হলো দুর্ভিক্ষ ও দুঃখদৈন্য যাতে মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় চোখে সর্ষেফুল দ্যাখে। পেট তখন কুলহু আল্লাহো আহাদ পড়তে শুরু করে অর্থাৎ এক প্রকৃত আল্লাহকে ডাকে। মন্বন্তরের পরেই যুগান্তর আসে। আযাবের চাবুক খেয়েই মানুষের সম্বিত ফিরে আসে।

বর্তমান সময়ে মানুষ একের পর এক দুঃখের আঘাতে জর্জরিত। তাই সূরা-দুখানের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার জন্য কলম হাতে তুলে নিয়েছি মহান আল্লার কাছে দোয়া করার পর। তিনি জ্ঞান না দিলে কেউ জ্ঞান পেতে পারে না। তিনি মানুষকে জ্ঞান দানের জন্য সূরা-দোখান দিয়েছেন। দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়েই মানুষ অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করে। দুঃখ বিনা দুনিয়াতে সুখলাভ হয় না। দুঃখ হলো কাঁটা। তাই কাঁটা দেখে হতাশ হওয়া উচিত নয়। কবি লিখেছেন,

"কাঁটা হেরী ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয়কি মহীতে"।

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর মহান রবের কাছে দোয়া করেছিলেন তিনি যেমন হযরত ইউসুফকে (আঃ) দুর্ভিক্ষ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাকেও তিনি যেন অনুরূপ দুর্ভিক্ষ দিয়ে সাহায্য করেন। আল্লাহ-পাক তাঁর এ দোয়া কবুল করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা দেখে মোশরেক প্রধান আবু সুফিয়ান আল্লার রসূলের কাছে এসে দেশবাসীর জন্য মহান আল্লার কাছে দোয়া করার আবেদন জানান যেন তিনি এ বিপদ দূর করেন। ভালবাসা নয় আঘাত দিয়ে আল্লাহ পাক তাদের চৈতন্যদয় করেন। কিন্তু এ আঘাত ছোট। এর চেয়েও বড় আঘাত কেয়ামতের আঘাত। এভাবে তিনি প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

আরব সভ্যতার মস্তিষ্ক হলো মিশর। হযরত ইউসুফ (আঃ) ক্রীতদাস হিসাবে এখানে প্রেরিত হয়েছিলেন আর ঐশী রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এইরূপে বিশ্বনবী জীবন শুরু করেছিলেন আর বাদশার বাদশাহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি সরকারে দোজাহান হয়েছিলেন। ইহকাল ও পরকালের বাদশাহ হয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীতেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে স্বীকৃত আর পরকালেও মানব মুকুট হিসাবে সমাদৃত হবেন। এই হলো মোকামে মোহাম্মদ (দঃ)। তিনি নবীকূল মুকুটমণি।

আজ পৃথিবীর খোদাদ্রোহী শাসকরা তাঁকে জঙ্গী হিসাবে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ উপহাস করছে কিন্তু আগামী কাল তাঁর উম্মতের মধ্যে তারাই সামিল হতে বাধ্য হবে। আজকের আমীররা সেদিন ফকীর হয়ে যাবে। আরবের আমীররা, মিশরের ফেরাউনরা আযাবে নিমজ্জিত হবে। কাল কাউকে ক্ষমা করবেনা।

কালের নিয়ামক তো আল্লাহ-পাক। তাই কালকে গাল দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

সূরা দোখানেই ফেরাউন ও একত্ববাদের পুনঃ প্রচারক হযরত মুশার (আঃ) উত্থানের ইতিহাস আছে। অনুরূপ ভাবে হযরত মুশার (আঃ) উত্তরসুরী নির্যাতিত হযরত ঈশারও (আঃ) আগমন ঘটবে। বেহুদা ইহুদীবাদীরা বিশ্বের মানচিত্র থেকে শেষ হয়ে যাবে। তিনি শেষ নবীর উম্মতকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। বিজয়ীবেশে বায়তুল মুকাদ্দসে প্রবেশ করবেন। জায়নবাদী দাজ্জাল নিহত হবে। যন্ত্র দানবের অবসান হবে। রুহানী শক্তির উত্তরাধিকারী রুহুল কুদ্দুস বর্তমানে প্রচলিত বিকৃত খৃষ্টধর্মকে বাতিল ঘোষণা করবেন। খৃষ্টান মুসলমান হয়ে মোহাম্মদ বিরোধী চক্রান্ত পরিহার করে মিল্লাতে ইবরাহীম ও উম্মতে মোহাম্মদীর পতাকাতলে সামিল হবে। বৈদিক ব্রাহ্মন্যবাদীরা যেমন এককালে বুদ্ধের সত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিল অনুরূপভাবে কাশীর ব্রাহ্মণরাও হযরত নবী যুলকিফল বা কপিলাবাসী নবী, যিশু বা ইউসুফসহ মোহাম্মদকে সত্য নবী হিসাবে গ্রহণ করবে। এমন যুগান্তর আসবে যে যুগান্ত র ইতিপূর্বে আসেনি। ভারত আবার সারনাথকে চিনতে পারবে এবং 'সত্যমেব জয়তে' এই মহাবাণী উচ্চারিত হবে। আদম, নূহ, (মনূহ) ব্রহ্মা থেকে মোহাম্মদ সকলেই সত্যাশ্রয়ী হিসাবে গণ্য হবে। সকলেই পরম সত্য পরম সত্তার শরণাগত হবে। দেশকাল পাত্রের কোন ভেদ থাকবে না। এ মহাশুভদিন সমাগত হোক এই হোক আমাদের প্রার্থনা। আমিন, সুম্মা-আমিন।

সূরা-দোখান-তিন-রুকু-আয়াত ৫৯

প্রথম রুকুর ব্যাখ্যা - ১) হামীম ২) ওয়াল কিতাবুল মুবীন ৩) ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতীন মুবারাকাতীন ইন্না কুন্না মুনযিরীন ৪) ফিহা ইফরাকুন কুল্লু আমরিন হাকিমিন ৫) আমরান মিন ইনদেনা, ইন্না কুন্না মুরসেলিন ৬) রাহমাতাম মির রব্বিকা ইন্নাহু হুওয়াস সামিউল আলিম।

পূর্বোক্ত আয়াত সমূহে লায়লাতুল কদরের কথা বলা হয়েছে। এই বরকতপূর্ণ রাতে (লাইলাতুল কদরে) এই কেতাব নাযিল করেছি কেননা আমি লোকদিগকে সতর্ক করার ইচ্ছা করেছিলাম– এ ছিল সেই রাত যে রাতে বিজ্ঞতামূলক সিদ্ধান্ত সমূহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আমি এক রসূল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এ ছিল তোমার রবের তরফ হতে রহমত। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

উপরোক্ত ছয়টি আয়াতে যা বলা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য কেতাব ও তার বাহক নবীকে পাঠানো হয়েছে যিনি লোকদিগকে কেতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন যাতে মানুষ জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারে তাকে যাতে অজ্ঞানের অন্ধকার হাঁতড়ে চলতে না হয়। মহান রব শুধু তাকে পয়দা করে, শুধু তাকে খাদ্য পানীয় দিয়ে প্রতিপালন নয় বরং সেই সঙ্গে পথ প্রদর্শক দিয়ে পথ প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা

করেছেন। আসমান-যমীন মানুষ কোন কিছুই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি বরং এ সবের পিছনে এক জ্ঞানময় স্রষ্টার হাত আছে। তাঁর নাম আল + ইলাহ The Almighty অর্থাৎ একমাত্র ইলাহ। তিনি All in all তিনি সর্বশক্তিমান। এই আল্লার সাথে আরবীর 'হ' প্রত্যয় যোগ করে আল্লাহ হয়েছে। এর উচ্চারণ 'অ' ও 'আ' এর মাঝখানে। না অ, না আ, এই অ-কে স্ত্রীলিংগ করার জন্য 'আ' করা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বাংলা অভিধানে প্রত্যয় যোগ করে আল্লার স্ত্রী বানানো হয়েছে। শিব, দূর্গা, গণেশ, কার্তিক ইত্যাদি করা হয়েছে। পরবর্তীকালে একেই গোবৎস বলা হয়েছে। আরবীতে এই গোবৎসকে ইজলা করা হয়েছে। স্বর্ণগোবৎস বানিয়ে সামেরী পূজা করেছে। হযরত মুশা (আঃ) এই সামেরীকে বনী ইসরাঈলীদের দল থেকে বহিস্কৃত করেন। এবং তাকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করেন। তাকে গলায় পৈতে দিয়ে ঘোষণা করতে হতো আমি অপবিত্র আমাকে ছুঁয়োনা কিন্তু পরবর্তীকালে সে কাশ্মীরে পালিয়ে আসে আর ঘোষণা করে আমি পবিত্র আর তোমরা অপবিত্র। সে পৈতে ছুঁয়ে তার পবিত্রতার দাবী করে। এজন্য অচ্ছুতরা বলে এটা শয়তানের সুতো। আর্য ব্রাহ্মণদের কাছে সে বরণীয়। কাশ্মীর তাই বৈদিক ব্রাহ্মণদের কাছে ভূস্বর্গ। এই ইয়াম্বু বা জাম্বুদ্বীপ মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত। মিশর থেকেই যত ব্রাহ্মণ পরিবার, সাপ্রু পরিবার নেহেরু পরিবার ভারতে এসেছে। তেজ বাহাদুর সাপ্রুর পূর্ব পুরুষ এমনকি আল্লামা ইকবালের পূর্ব পুরুষরা মিশর থেকেই কাশ্মীরে এসেছেন এজন্য তারা জম্মুকে কাশ্মীর বলে। কা মিশর বা মিশর সদৃশ্য বলেই একে কাশ্মীর বলা হয়। কাশ্মীর আরবী শব্দ। নেহেরু আরবী শব্দ নহর আরবী শব্দ। আল্লামা ইকবাল ও তেজবাহাদুর সাপ্রু একই ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। ইকবাল বামুনজাদা হওয়ার জন্য গর্ব অনুভব করতেন। তিনি বলতেন –

আমার মতো কোথাও তুমি দেখবেনাকো হিন্দুস্তানে
বামুনজাদা হয়েও নিপুণ রুম তবরীজের তত্ত্ব জ্ঞানে।

ইকবালকে তাই নেহেরু সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁর মৃত্যুর একমাস পূর্বে তিনি মৃত্যুশয্যায় ইকবালকে দেখতে গিয়েছিলেন। নেহেরু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত চেয়ারে না বসে মাটিতে বসেছিলেন। আল্লামা কথা প্রসংগে নেহেরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কি জান তোমার ও জিন্নার মধ্যে কি ফারাক? নেহেরু চুপ করেছিলেন। আল্লামা বলেন তুমি পেট্রিয়ট আর জিন্না পলিটিসিয়ান। তিনি বলেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও গণতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র একসাথে চলতে পারেনা। তিনি বলেছিলেন 'বর্ণবাদ' থাকতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়।

"সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থাঁ হাঁমারা" কবিতায় কবি বলেছিলেন, 'মযহাব নেহি শিখাতা হ্যায় আপস মে বৈর রাখনা' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষ লেগেই আছে। ভারত আজ গোব্রাহ্মণ

প্রতিপালক রাষ্ট্র। তাই কোরনার মতো আযাব ও আয়াস এর মত গজব এদেশকে ঘিরে ধরেছে। তাই আল্লাতত্ব, কোরান তত্ব, নবীতত্ব না জানলে বিশ্বের মুক্তি ঘটবেনা। মোক্ষস্থান মক্কায় রয়েছে আল্লার উপসনাগৃহ শিবালয়। সেখানে শিবের লিঙ্গ নেই যা কলিঙ্গরা মনে করে। তাই ইয়াস আছড়ে পড়েছে কলিঙ্গে এবং সেখান থেকে যাবে ঝাড়খণ্ডে তথা বিহারে অর্থাৎ গোবলয়ের দিকে। গোবর্ধন বৃদ্ধির ফলে তাই কল্যাণ হবে না। এতে হর্ষবর্ধন বা ভাঁড়েদের বৃদ্ধি ঘটবে। রাজদরবারে বীরবলদের আবির্ভাব হবে। বীরবল ও মীর খসরুর গল্প সবার জানা।

ইয়াস মানে হতাশা বা নৈরাশ্য। ইয়াসের আগমনের ফলে যে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার কারণ নৈরাজ্যের বিস্তার। রাম রাজ্যের মাৎসান্যায়ের বিস্তার। বাবা আশারামের অবৈজ্ঞানিক চিন্ত াধারা।

ফসল ও মানুষের ব্যাপক ক্ষতির ফলে যে মড়কের সৃষ্টি হবে তাতে দুঃখদৈন্য ও আকাল অবশ্যম্ভাবী। মসজিদ ভেঙ্গে দেউল নির্মাণের ফলে দিল্লী দেউলিয়া হয়ে যাবে। আকালের ফলে কালান্তর ঘটবে। তাই সূরা দোখানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অপরিহার্য কর্তব্য। বুদ্ধের ভারতকে যুদ্ধের ভারতে পরিণত করার অর্থ হলো আত্মহত্যা। তাই বিসমিল্লায় গলদ, 'ক' অক্ষর গোমাংস এসব বালসুলভ কথা থেকে পণ্ডিত মূর্খদের বিরত হওয়া উচিত। পুরীতে পাণ্ডাদের প্রাধান্য দেবদাসীর মতো কুপ্রথা, কাশিতে গঙ্গায় সন্তানবিসর্জন, কুণ্ডল, কবচ ধারণ করবে। বাবা বিশ্বনাথের আর্শীবাদে কোরনা থেকে মুক্তি প্রভৃতি কুসংস্কার মূলক কথার উপর দায়িত্বশীল লোকেদের নির্ভরতা দুঃখজনক অজ্ঞতা। সময়ই বলে দেবে সত্য কোন দিকে।

সাত আয়াত থেকে বলা হয়েছে যিনি সর্বজ্ঞ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা তিনি আকাশমণ্ডল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এর রব বা প্রতিপালক আসমান যমীনের মাঝখানে যাকিছু আছে তারও রব। প্রকৃত বিশ্বাসকারীদের আকিদা এমনটা হওয়া উচিত। অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে তিনি ছাড়া কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই। তিনিই জীবনদেন, তিনিই মৃত্যুদেন। এককথায় তিনি জীবন মৃত্যুর মালিক। তিনি তোমাদের রব ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের রব কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লোকেদের কোন সন্দেহাতীত বিশ্বাস নেই। এরা অজ্ঞেয়তাবাদী। এরা সংশয়বাদী যেমন পণ্ডিত নেহেরু, পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ান প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আলি পণ্ডিত নেহেরুকে তাঁর লাইব্রেরীতে বসে ইসলামী সাহিত্য পড়ে তার সন্দেহ দূর করার জন্য পীড়াপিড়ি করতেন। নেহেরু মাওলানাকে এই বলে সরে পড়তেন যে, যে ব্যাপার সম্পর্কে আমি আপনার সাথে একমত নই তা থেকে তিনি যেন তাঁকে অব্যহতি দেন। মওলানা নাছোড়বান্দা হলেও তিনি তো আর জবরদস্তী করতে পারেন না কারণ ইসলামে

জোর জবরদস্তী নেই কিন্তু তিনি নেহেরুর পিছে চলতেন না কিন্তু মওলানা আযাদ নেহেরুর পিছনে চলতেন ফলে তিনি তাকে ইসলামের বিপরীতদিকে চালিয়ে দেন। মওলানা আযাদও ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন ও আরব জাতীয়তাবাদীদের ন্যায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুণর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মওলানা আযাদের এই পদস্খলনকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বলে মন্তব্য করেছেন জনৈক মওলানা। মওলানা মোহাম্মদ আলি (রহঃ) জহরও (রত্ন) ইকবালের অত্যন্ত গভীর ভক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন মুসলিম ভারত ইকবালের কাছে সবচেয়ে বেশী ঋণী। ইসলামের ভসিষ্যৎ সম্পর্কে ইকবালের অকুণ্ঠ বিশ্বাস ছিল। তিনি গান্ধীবাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। গান্ধীবাদী নেহেরুকেও তিনি পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার সেবক ও গুণগ্রাহী আখ্যা দেন। তিনি গান্ধীকে গ্রেটেষ্ট এন্টিন্যাশান্যাল আখ্যা দেন। তিনি জিন্নাকেও তার বিভ্রান্তি থেকে সরিয়ে আনেন। ভাগ্যের পরিহাস গান্ধীজীর জন্যই ভারত ভেঙ্গে যায় এবং তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের হাতে নিহত হন। বর্তমান শাসক সম্প্রদায় এখন ডিজিটাল বা কানা দাজ্জালী সভ্যতার ঠিকাদার হওয়ার জন্য কোরোনা ও যশের শিকার হয়েছে। সেই দোখান বা মেঘমালা ছত্রাকারে দেশের আকাল ছেয়ে রয়েছে। উড়িষ্যা বা কলিঙ্গতে তার দাপট সারা দেশ দেখেছে। এই আযাব দূর হবে না যতক্ষণ না সংশয়বাদ পরিত্যাগ করে মানুষ পবিত্র কোরান ও তার বাহকের পথে ফিরে না আসে।

মানব সভ্যতার পতনের কারণ ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংঘাত। এই সংঘাত শুরু হয়েছিল ইউরোপে। চার্চের দুর্নীতি ও মার্টিন লুথারের বিদ্রোহ। রাষ্ট্রীয় চার্চের উদ্ভবের ফলে ডিভাইন রাইট অব কিংশিপ পরিত্যাক্ত হয়। Devils vilis right of king ship -এর উদ্ভব হয়। পাশ্চাত্যের ঐহিকতা রাষ্ট্রনায়কদের চেঙ্গিজ বানিয়ে দেয়। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন –

"রাষ্ট্র ও ধর্মে সংঘাত শুরু হলো যবে
সভ্যতার অধঃপতন শুরু হলো তবে।"

ধর্ম হয়ে গেল কল্পনাবিলাস ও রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে গেল চেঙ্গিজী লীলা। ধর্ম ও রাষ্ট্র সবই কল্যাণ বঞ্চিত হয়ে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা মানুষ দেখেছে। এখন তৃতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা মানুষ দেখবে।

এই চেঙ্গিজী লীলা বন্ধ করবার জন্য ইরাণে রাষ্ট্রধর্মকে ইমামতে পরিণত করে জগতে এক নয়া বিপ্লব এসেছে। আফগানিস্তানের যাকীররা আমিরাত বা খেলাফত কায়েম করেছে। তুর্কী হারানো খেলাফত ফিরে পেয়েছে। দাজ্জালী শক্তির বা চেঙ্গিজী শক্তি পশ্চাদপসারণ করছে। সারনাথকে ছেড়ে সকলেই অনাথ হয়ে পড়েছে নীতিহীন দুর্নীতিবাজ হওয়ার জন্য। বেদাতী হওয়ার জন্য। দুর্যোধনরা দুশাসনরা পিছু হটছে।

আতি সত্বরই হযরত ঈশার (আঃ)

আগমন ঘটবে। যুদ্ধবাজ ইসরাঈল ও তার দোসররা গোধনপ্রিয় হওয়ার জন্য সলিল সমাধি প্রাপ্ত হবে। মোক্ষস্থান মক্কা, বায়তুল মুকাদ্দস ও মসজিদে নববী শের্ক ও বেদাত মুক্ত হবে। ফ্যারাও, রাও বা সূর্য পূজারীদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। আসমান যমীনের মালিকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র মানবসেবায় নিয়োজিত হয়ে যাবে। জগতে ওমরের (রাঃ) ইনসাফ ও আলীর জীবনধারা ফিরে আসবে। মোহাম্মদের নামের মহিমা জগতে উজ্জ্বল হবে। প্রকৃত জঙ্গী, সন্ত্রাসবাদী কে তা অচিরেই মানুষের সামনে প্রতিভাত হবে। ঐশী ইতিহাস-ই শেষ কথা বলবে। মনগড়া ধর্ম , মনগড়া ইতিহাস কালের যাদুঘরে নিক্ষিপ্ত হবে। বামুনজাদা ইকবাল (রহঃ) বলেছিলেন –

"মুসলিম তুমি হৃদয় রাখ আশায় আশায়
খোদা কভু ভুল করেনা তার কারারনামায়
মুসলিম ফের পাবে ফিরে খোদার দয়ায়।
হিন্দী মেধা তুর্কী বাহু, আরব্য সে কথার ধরণ
'পাক ধরমের কেতাবখানি নতুন করে হবে বাঁধাই
হাসেমী এই শুষ্ক শাখায় আবার হবে পাতার বাহার"।

দুর্যোগের কালোমেঘ কেটে যাবে। এক অখণ্ড পৃথিবী, এক অখণ্ড মানবজাতি ইনশাআল্লাহ আত্মপ্রকাশ করবে।

আজকে আমরা পর্যদুস্ত
ভয় নেই ভাই ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত।
হারানো সুদিন জগতে আবার আসবে ফিরে
মহামানবের মহামানবতার সাগর তীরে।
মানুষের লোভ বাড়ায়ে দিওনা তার জয়ধ্বনি করে
মানুষের ত্রাতা ভাবলে অমনি আল্লাহ যান সরে।

আল্লার ক্যালেণ্ডার

- আকতারী বেগম

চাঁদ হলো আল্লাহ-পাকের ক্যালেণ্ডার। ধার্মিক লোকেরা তাই চন্দ্রমাস অনুযায়ী চলেন। চন্দ্র মাস বারোটা। বারো মাসের মধ্যে চার মাস হলো হারাম মাস অর্থাৎ সম্মানিত মাস। এই মাস সমূহের সম্মান রক্ষা করা সদ্ধর্মীদের কাজ। এটা বিধর্মীদের কাজ নয়। স্বধর্মীদের কাজ নয়।

সম্মানিত মাস হলো রজব আর তিনটি হলো জিলকদ, জিলহজ্ব ও মহরম। এ মাসগুলো হলো আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের মাস। জামাদিয়াল আউয়াল ও জামাদিয়াস সানি শীতের মাস। রবিউল আউয়লও রবিউসসানি বসন্তের মাস।

রজব হলো আরবী ক্যালেন্ডারে সপ্তম মাস। এ মাসে দ্বীনীকাজকে বরকতমণ্ডিত করা হয়েছে। রমযান আত্মশুদ্ধির মাস আর তার প্রস্তুতি শুরু হয় রজব ও সাবান থেকে। বেশী বেশী করে কোরান হাদিস চর্চা, মরা ইসলামকে জিন্দা করা, মরা সুন্নতকে জিন্দা করা, নফল এবাদত জিকির, আল্লার রাস্তায়, আল্লার দ্বীনের তরক্কীর জন্য খরচ করা। দ্বীনী বই, পত্র-পত্রিকার জন্য খরচ, নামাজ রোজা, তাকওয়া বা আত্মসংযমের জন্য খুবই জরুরী। এর ফলে 'কলবে মুনিব' বা আসক্তদীল পয়দা হয়। খোদার প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়।

আল্লাহ-পাক মানুষের কল্যাণের জন্য যা দান করেছেন তা হলো জিকির বা কোরান মাজীদ ও মহানবী। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে মানুষ এ থেকেই মুখ ফিরিয়ে থাকে। পবিত্র কোরান হলো জিকির বা মহাস্মারক। এই মহাস্বারক গবেষণা সহকারে চর্চা করলে মন বলে উঠবে – আল্লাহ আমার রব তিনিই আমার সব
তিনি কাদের গনি তিনি সবার থেকে ধনী।
আমি গোলাম তার আমি ভয় করিনা কার।
আল্লার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলে আল্লাহ পাক তাকে নির্ভীক মহানেতা বানিয়ে দেবেন। কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন –
আল্লাকে দিলে ভিখ, তুমি হয়ে যাবে মহানেতা নির্ভীক।
এতে দুনিয়াতে পাবে খেলাফত আর আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চশীলের অংশ

সম্মান দিতে জানেনা তারা বীরাঙ্গনা নয়। এদেশের নারীরা একদিন অসূর্যস্পর্শা ছিল। গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রবাদীদের পতনের কারণ হবে। সত্যকে যারা বলের বন্যায় ভাসাতে চায় তারা নিজেরাই ভেসে যাবে। মানুষ ইন্দ্রিয়পরস্ত হয়, ইন্দ্রপ্রস্থ রচনা করে তাহলে অন্ধধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র সত্ত্বেও পঞ্চ-পাণ্ডবের হাতে পরাজয় বরণ করবে। তাই কবি বলেছেন –

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির
আঘাতে আঘাত করি পিত
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো উপনীত।"

বৃহত্তর বেঞ্চের হাকিমগণ যদি আহকামুল হাকিমের কেতাব অনুযায়ী হেজাবের পক্ষে রায় দেয় তাহলে প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে না।

বাজেট ২০২২ এক শুন্যগর্ভ পরিকল্পনা

- পর্যবেক্ষক

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ যে বাজেট পেশ করেছেন তা নিয়ে নানা মহলে নানা আলোচনা হয়েছে। নানা জন নানা কথা বলেছেন কিন্তু আমরা সেদিকে যাচ্ছিনা। অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন এ বাজেটের সাফল্য নির্ভর করছে কয়েকটি যদির উপর। যদি বর্ষা ভাল হয়, যদি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম না বাড়ে, যদি মহামারির প্রকোপ বন্ধ হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। সুবৃষ্টি নির্ভর করে ধন্যরাজা ও পুন্যদেশের উপর। রাজা ধন্য হলে দেশ পুন্য হতো কোভিড, মহামারী এদেশের উপর চেপে বসতোনা। মাস খানেক আগে মাঠের ধান মাঠেই পচে গেল। ঘরে এনে খামারজাত করা গেল না। মাঘ মাসের এই বৃষ্টিতে সর্ষেরখেত সাবাড়। ভোজ্য তেলের আকাল হবে। আসমানের সরকারকে সন্তুষ্ট না রেখে তারা তাকে রুষ্ট করেছে। তিনি রুদ্ররূপে হাজির হয়েছেন। আলুও নাবী ধসা রোগের শিকার হবে। দেশের ইয়াসা বা হতাশা ছাড়া কিছুই নেই।

প্রধানমন্ত্রী আগে ১৫ লাখ চাকরীর কথা বলেছিলেন কয়েক লাখ টাকা সবার একাউন্টে আসার কথা ছিল সে তো কই এলনা। এবার ষাট লাখ চাকরীর আশাও দুরাশা। কারণ নায়েব নবী নয়, নবী বিরোধী কবিরা দেশ চালাচ্ছে। তাই সোনার ভারত ক্রমশ দেনার ভারতে পরিণত হচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। জিনিসের দাম দেড়া ডবল হয়ে যাচ্ছে। রাজায় রাজায় দ্বন্দ্ব নল খাগড়ার প্রাণ যাচ্ছে। দেশে বণ্ডেড লেবারের সংখ্যা বাড়বে। আমাদের দেশের লোকেদের মাথা পিছু তিন লাখ টাকার অধিক দেনা। তাই নাসবন্দীর পাপও সরকারকে করতে হবে। বিবাহিত পুরুষও ধর্ষক হয়ে যাচ্ছে আইনের ঘোর প্যাঁচে। গোদেবতা তো হাম্বা হাম্বা ছাড়া কিছু করতে পারবে না। গরু দেবতা হলে গোহারান হারা ছাড়া গোবৎসদের করার কিছুই থাকবে না।

আমাদের ধন গোধন, গোমূত্র ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। মহুয়া মৈত্রকে ধন্যবাদ তিনি অন্তত সেকথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। সরকার লোক হাসাচ্ছেন। গোবর্ধন, হর্ষবর্ধনরা দেশ চালাচ্ছে। রাজ্যবর্ধনের আশা নেই।

বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ

- আলবেরুণী

এটা সবার জানা কথা যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য স্বাধীন ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন। খেলাফত ছিল এধরণের এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। খেলাফতের প্রভাবেই মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সূচনা হয়। এক স্বাধীন সচেতন মানসিকতার উদ্ভব হয়। খেলাফতের পতনের পর রাজতন্ত্রের অধীনে এই ভাবধারা ব্যাহত হয় ও রাজতন্ত্রের অধীনে এক সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের জন্ম হয়। এরাই ছিল রাজতন্ত্রের স্তম্ভ। এই রাজতন্ত্রের অধীনে দামেস্ক, বাগদাদ, দিল্লী ও কর্ডোভায় যে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর জন্ম হয় তারা ইসলামী বুদ্ধিজীবী নয়, তারা মুসলিম বুদ্ধিজীবী। খেলাফতের পতনের ফলে রাষ্ট্রপরিচালনায় জনসাধারণের অংশ না থাকায় তাদের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে আধা বৈরাগ্যবাদী সুফীবাদের জন্ম হয়। এই সুফীবাদ আল্লার সম্পর্কে যত ভেবেছে আল্লার সৃষ্টি সম্পর্কে তত ভাবেনি অথচ আল্লার নির্দেশ এটাই ছিল। রাজা-বাদশারা ছিল দুনিয়াদার আর সুফিরা ছিল দুনিয়া বিমুখ। ইসলাম যা চেয়েছিল এছিল তার বিপরীত। একদিকে রাজনৈতিক গোলামী অন্য দিকে ধর্মীয় গোলামী সাধারণ মুসলমানদের মানসিক সজীবতা নষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ শেষ পর্যন্ত এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে গেল যে মযহাবের নির্বিচার গোলামীই মুসলমানদের বিধিলিপি হয়ে রইল কারণ রাজনীতিক ও সুফী কেউ বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। পরিণামে বাগদাদের পতন ঘটলো। আরবদের হাত থেকে নেতৃত্ব তুর্কীদের হাতে চলে গেল। তারা নিঃসন্দেহে মুসলিম জাহানের বাহুবল ছিল কিন্তু মুসলিম জাহানের মস্তিষ্কের পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হয়নি বরং যারাই একাজ করেছেন তারাই কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

মুসলিম ভারত মুসলিম জাহানের এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। ভারতে মুসলিম রাজতন্ত্র ছিল তুর্কীর মতই সেকুলার। গদী রক্ষাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ইসলামী শিক্ষা ও চেতনার বিস্তার সাধন তাদের লক্ষ্য ছিল না। এদেশের বিপুল সংখ্যক অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের গণশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। শিক্ষার অভাবে তারা ইসলামের যথার্থ স্বাদও পায়নি, ইসলামী সাম্য ও মানবিকতাও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। রাজতন্ত্রের সমর্থক অভিজাত শ্রেণী শিক্ষাকে তাদের দুনিয়া লাভ ও দুনিয়া ভোগের জন্যই কাজে লাগিয়ে ছিল। সাধারণ মুসলমান নামেই রাজার জাত ছিল, তাদের শিক্ষাও ছিলনা, পয়সাও ছিল না। তাদের মানসিকতাও ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরাণিক মানসিকতার হেঁয়ালী

পনা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে নি। ফলে তারা পীর পূজায়, মাজার পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই কবর মুখী মানসিকতা তাদের মানসিক বিকাশেরও কবর রচনা করেছিল। দিল্লীর সিংহাসনে অথবা বাংলার মসনদে কে আসছে কে যাচ্ছে তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। এই গণমানসিকতার কারণে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এত সহজে সম্ভব হয়েছিল।

ইংরেজ রাজত্ব মুসলমানদের এক বাড়তি বিপদের সম্মুখীন করেছিল। তারা তাদের বাদশাহী নবাবী জমিদারী সবকিছু হারিয়ে জুলুম অত্যাচার ও শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়ে পড়লো। তাদের ভাষা সংস্কৃতি বিপন্ন হলো। হিন্দুদের সহায়তায় বেনিয়া-ব্রাহ্মণ শাসন তাদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। যে প্রতিক্রিয়াশীল, মানবতা বিরোধী শোষণমূলক ব্রাহ্মণ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য ভারতের পূর্বাঞ্চলের ব্রাত্য জনসাধারণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল শেষ পর্যন্ত সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন ও শোষণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের উপর চেপে বসলো। ভারতবিভাগ তথা বঙ্গ বিভাগের ফলে তারা নিরাপত্তাহীনতারও শিকার হয়ে পড়লো। শিক্ষিত মুসলমানরা ওপার বাংলায় পাড়ি জমালেন যাদের পালাবার পথ ছিলনা তারাই এপারে রয়ে গেলেন। কংগ্রেস শাসন ছিল নামে সেকুলার, কাজে কাজে সাম্প্রদায়িক। তারা ইসলামিয়া কলেজের কাজ শুধু নয় নাম পর্যন্ত পাল্টে দিল। মাদ্রাসাশিক্ষার বারোটা বাজিয়ে দিল। ওয়াকফবোর্ডকে কুক্ষিগত করলো। তারা জীবনের কোন বিভাগেই কোন National Leadership এর জন্ম হতে দিল না। সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেব জনাব খায়রুল আনাম খাঁ যারাই এসমাজের জন্য কিছুটা ভাবতেন তাদের উপরই সাম্প্রদায়িকতার লেবেল এঁটে দেওয়া হলো। শিক্ষা নেই, পয়সা নেই, নিরাপত্তাও নেই, কোথাও কোন সহানুভূতি ও নেই। এমতাবস্তায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম হতে পারে না। যাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোন স্বাধীনতাই নেই, যারা নিজেদের জানমাল ইজ্জতআবরু নিয়ে সদা-সর্বদা বিব্রত তাদের কাছ থেকে দিনযাপনের গ্লানি ছাড়া কিই-বা আশা করা যেতে পারে? অথচ বুদ্ধি বৃত্তিক জাগরণ ছাড়া এ অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব।

জামাতে ইসলামীর লক্ষ ছিল এই ইসলামী জাগরণ। তারা এমন মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিল যারা আল্লা ছাড়া কারো গোলাম হবে না। জামাত রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সুফীতন্ত্র, পীরতন্ত্র ইত্যাদি মানতনা। প্রাচীন ধর্মীয় গোলামী ও আধুনিক খোদাদ্রোহী রাষ্টতন্ত্রের গোলামী থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শিখেছিল। তারা ফেকার নির্বিচার গোলামী ও মানতনা বরং কোরান-সুন্নাহকে সামনে রেখে বর্তমান যুগের সমস্যাকে অনুধাবন করবার এক মানসিকতা জামাতের লোকেদের মধ্যে পয়দা হয়েছিল। তারা তাদের নিজেদের

জামাতকেও সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করতেন না। এটা ছিল মুসলমানদের চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে এক বিরাট অগ্রগতি। জামাত এই অগ্রগতিকে ধরে রাখবার জন্য চারদফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। প্রথমত চিন্তার পরিশুদ্ধি, দ্বিতীয়ত সৎ লোকদের সন্ধান, সংগঠন ও ট্রেনিংদান, তৃতীয়ত সামাজিক সংশোধন ও পুনর্গঠন, চতুর্থত রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধন।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ছিলনা বলেই রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধনের কথা বলা হয়েছে কেননা রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বাধীনতার পূর্বে ও অনৈসলামী ছিল এবং স্বাধীনতার পর ও অনৈসলামী রয়ে যায় বরং অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় মুহুর্তেই জামাতে ইসলামী হিন্দ তার রাষ্ট্রব্যবস্থা সংশোধনের কর্মসূচী মুলতবী করে দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জামাত কর্মসূচী গ্রহণ করতে থাকে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির নাজুকতা ছিল এর কারণ একথা ঠিক কিন্তু এতে পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়ে জামাত যে পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছে একথাও ঠিক।

রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধনের কর্মসূচীর পুনরুজ্জীবন ব্যতীত এ অবরুদ্ধ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। যে জাহেলিয়াতের পরিবর্তনের জন্য জামাতের উত্থান হয়েছিল জামাত নিজেই যদি সেই জাহেলিয়াতী রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধনের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ না করে তবে তার মকসুদে মঞ্জিল কোন দিনই সামনে আসবেনা। যদি দাওয়াত ও তবলীগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে একামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব হয় তাহলে তবলীগ জামাতের সাথে জামাতের মৌলিক পার্থক্য কোথায়? সকলে মুসলমান হলে যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তাহলে মুসলমান রাষ্ট্রগুলো কবেই না ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যেত। মরহুম মওলানা মওদূদী তাই কোন দিন তিনদফা কর্মসূচীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। মরহুম মওলানা মওদূদী বলেন, 'চতুর্থ কারণটির মধ্যমেই তো আপনাদের আসল উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। এটি যদি আপনাদের কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত না হয় তো পূর্বোক্ত কাজ তিনটি নিছক পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই হবে না। আর তিনটি কাজ করে আপনারা বড় জোর ধর্মপ্রচারকদের একটা দলে পরিণত হতে পারেন, এদেশে আগেও যার কোন অভাব ছিল না। নৈতিক সংশোধন মূলক প্রচেষ্টার দ্বারা জাহেলিয়াতের সয়লাবকে আগেও কখনো প্রতিরোধ করা যায়নি, আর এখনও করা যেতে পারে না। অতঃপর মওলানা লেখেন যে ইপ্সিত ফল লাভের জন্য জামাতে ইসলামীর এই গোটাপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছিল, তা কর্মসূচীর এই চারটি অংশই যুগপৎ কাজ করার দাবী জানায়। সেই ফল লাভ বাস্তবিকই যদি আপনাদের কাম্য হয় তো এই পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে অথবা এর ভিতর কিছু কমবেশী করে অথবা এর কোনটিকে অগ্রাধিকার দান আর কোনটিকে

স্থগিত রেখে আপনারা নিজেদের আন্দোলনের ব্যর্থতা ডেকে আনা ছাড়া আর কোনই ফায়দা হাসিল করতে পারবেন না।

আমি আমার নিজের বক্তব্য বলছি না আমি সেই মহান মণীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি যিনি ছিলেন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। জামাতের মধ্যে যে স্থবিরতা ও প্রাণ চাঞ্চল্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মূল কারণ এখানে। এতে শুধু যে জামাত তার গতিশীলতা হারাবে তা নয় বরং জামাতের সমালোচনার অধিকার তার সদস্যদের দিয়েছে। রসুলুল্লাহ ছাড়া সবার সমালোচনা করা যাবে। জামাতের গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে No one is avbove criticism not even the Jamat. অর্থাৎ 'কেউ সমালোচনার উর্দ্ধে নয়, এমনকি জামতও।' এর থেকে বড় চিন্তার স্বাধীনতা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সে ফোরাম জামাতে কোথায়? মজলিসে নোমায়েন্দাগান আছে বটে কিন্তু সব আরকান সেখানে পৌঁছাতে পারে না। সেখানে কি হয় না হয় কোন সদস্য তা জানেনা। ফলে জামাতের অগ্রগতিতে তাদের কোন অংশ থাকেনা। ফলে জামাত সম্পর্কে তাদের মধ্যে উদাসীনতার সৃষ্টি হয়। উপর থেকে যা নির্দেশ আসে তারা তা পালন করে। উপরওয়ালারা যদি ভুল করে তবে তার আর সংশোধন হয় না। এটার পরিবর্তন হতে পারে যদি প্রতি হালকায় আরকানদের জামাত সম্পর্কে ও তার পলিসি ও পোগ্রাম সম্পর্কে মজলিসে নোমায়েন্দাগনের মতই সমালোচনা করার, সচেতন করার অধিকার দেওয়া হয়। এতে জামাতের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সদস্যরা সচেতন হবে। জামাতের নিম্নস্তরেও স্বাভাবিক নেতৃবৃন্দের জন্য হবে জামাত পরিচালনার জন্য লোকের অভাব কোন দিনও হবে না। জামাত মিল্লাত মুলুকের জন্য নেতা রপ্তানি করতে পারবে। কিন্তু আজ ভিন্ন অবস্থা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। জামাতেরি বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য লোকের অভাব দেখা দিচ্ছে। চিন্তার স্থবিরতা এর কারণ। সব সদস্যদেরই চিন্ত ভাবনার জন্য তাগিদ দিতে হবে। চিন্তা-ভাবনাই বেদুইনদের সাহাবা বানিয়ে দিয়েছিল। সেখানে একজন বৃদ্ধাও প্রকাশ্য দরবারে হযরত ওমরের ভুলধরতে পারত। এজন্য হযরতওমর (রাঃ) তাকে সুরার মাধ্যমে আসার পরামর্শ দেননি। আমরা বেশি নিয়মতান্ত্রিকতার জালে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা চিন্তা ভাবনাকে ভয় পায়। তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি। ফলে নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা হয়, অগ্রগতি হয় না। এতে জামাত জনকল্যাণমুখী সংস্থা হবে ইসলামী জাগরণের আন্দোলনকারী হবে না। আমরা কোনটা চাই তা আমাদেরই বিবেচনা করতে হবে।

পঞ্চশীল

- হাসিবুল আবেদীন

আর.এস.এস. প্রধান গোলওয়ালকার Nationhood Difined নামে যে বই লিখেছেন তাতে বলা হয়েছে মুসলমানদের এদেশে অধিকারবিহীন প্রজা হিসাবে থাকতে হবে। তারা নামাজ পড়তে পারবে তবে তারা কাঁচা খুলে নামাজ পড়বে কি কাঁচা দিয়ে নামাজ পড়বে সেটা তাদের ব্যাপার। ভারতে থাকতে হলে তাদের রাম নাম গাওয়ার অধিকার থাকবে। এই রাষ্ট্রবাদকে কায়েম করবার জন্য তারা পরীক্ষা শুরু করেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। কর্ণাটকে তাদের প্রোগ্রাম হলো মুসলমান মহিলাদের হিজাব পরে শিক্ষালয়ে প্রবেশ করা চলবে না। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ইতিপূর্বে মহিলাদের উর্ধাঙ্গে কাপড় পরতেও দিতনা। টিপু সুলতান তাদের বস্ত্র পরার অধিকার দেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অশালীন। তারা আজ গুরুগাঁই প্রথা জারী রেখেছে। বাসর ঘরে প্রথম তিনরাত গুরুর সাথে থাকতে হবে। শালীনতাই তাদের চক্ষুশূল। তাদের জন্মের ঠিক নেই। রক্তও শুদ্ধ নয়। ক্ষত্রিয় রাজা অম্বার পূর্ব পুরুষের জন্ম কাহিনী শুনিয়ে বুদ্ধ তাকে নিরস্ত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের "বাউনের মেয়ে" উপন্যাসখানি পড়ে দেখুন। এর প্রতিকারের জন্য গৌতম বুদ্ধ পঞ্চশীল বা পাঁচটা শালীন আচরণের কথা বলেছিলেন। অশালীনতা হলো পাপ। তাদের দেবতাও দেবদেবীরা অশ্লীল। তারা যেমনি অশ্লীল তেমনি বখিল। এই দুটো হলো শয়তানের বৈশিষ্ট্য। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। বৌদ্ধরা ছিল শীল ও ভদ্র। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথা কে না জানে? যার মধ্যে শালীনতা নেই তার ভদ্রতা নেই। যারা অভদ্র ও অশালীন তাদের রাজত্ব বেশি দিন টিকেনা। ইতরে মরলে যমের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

কর্ণাটকের হিজাব বিরোধী দুশাসন দুর্যোধনের ফল। এ কালাধন, এ কালাকানুন তাই দেশ ও দেশের বাইরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। যারা মনে করনে Might is Right, Almightly তাদের ছেড়ে কথা কইবে না। ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকেই কালাপাহাড় জন্মলাভ করবে। মুসলমানদের মধ্যে চাঁদসুলতানার মতো মহিলা জন্ম লাভ করবে। তাদের আল্লাহ-আকবর ধ্বনি আসমানে শ্রুত হবে। পৃথিবী মগের মুলুক নয়। এটা রবের মুলুক কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানেনা।

কোরোনার কল্যাণে এখন সারাবিশ্বে পুরুষ ও মহিলারা হিজাব পরতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। ১০০জন গেরুয়াধারীর বিরুদ্ধে একজন মুসলিম মহিলা যদি আল্লাহো আকবর ধ্বনি তুলতে পারে তাহলে লক্ষ খালেদা জন্ম গ্রহণ করা বিচিত্র নয়। মনে রাখতে হবে প্রথম মুসলমান পুরুষ নয়, নারী। সেই নারীরা আজকে সামনের সারিতে। এই নারীদের যারা

পরবর্তী অংশ ১১ পাতায়

আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে গাণিতিক ধারণা

- মোঃ কুতুবউদ্দিন সরদার (পিএইচডি স্কলার, ম্যাথমেটিক্স, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি)

আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা মহাগ্রন্থ আল কোরআনই যথেষ্ট। কারণ এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে ১৪০০ বছর পূর্বে যে সকল বিভিন্ন ঘটনা, তথ্য এবং তত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে সে সময় বিজ্ঞান এই সমস্ত বিষয় আবিষ্কার করা তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারত না। বহু শতাব্দী পর অসংখ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণের সাহায্যে আজ বিজ্ঞান সেগুলো আবিষ্কার করে চলেছে। আজ অবধি আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কৃত বিষয় আল কোরানে উল্লেখিত ওই সমস্ত বিষয়গুলো পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সকল অচিন্ত্যনীয় বিস্ময়কর ঘটনা বা প্রতিভার তথ্য ও তত্ত্ব সে সময়ে কে আল কোরানে উল্লেখ করতে পারে? নিশ্চয় কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ মানুষের হলে সেখানে ভুল থাকত, একমাত্র নির্ভুল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। আল্লাহ শুধু আল কোরানেরই স্রষ্ঠা নন তিনি বিশ্বজগতের সকল কিছুরই স্রষ্টা। তথাপি আল কোরান সম্পর্কে মানুষের যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব, চিন্তার স্থুলদর্শীতার কারণে অবিশ্বাসীরা কোরানের সমালোচনা করে এবং আল্লাহের অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দিহান পোষণ করে, অগ্রসর হয় নাস্তিকতার পথে এবং গর্ব করে বলতে থাকে There is no God এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল বলেন-

'কণ্ঠের বাক শকতি গরবে হায়রে মানব
অন্ধ আজ
খোদার মহিমা করিতে বিচার এতটুকু তার
হয়না লাজ।'

আমরা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর নেয়ামত উপভোগ করছি কিন্তু মানুষের এমন পোড়া কপাল যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা তো দূরে কথা অবিশ্বাসীরা তাঁর অস্তিত্বতের অস্বীকার করতেও একটু ভাবেনা। আল্লাহ সূরা রহমানে মানবজাতির প্রতি তাঁর অশেষ নেয়মতের কথা বার বার উল্লেখ করছেন আর আমাদেরকে প্রতিবারই জিজ্ঞাসা করেছেন এভাবেঃ "অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?" মানুষ যদি আলকোরান নিয়ে একটু রিসার্চ করে তবে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে অসংখ্য নিদর্শন পেয়ে যাবে। সাতসমূদ্রের পানি কালি করে আল্লাহর বিষয়ে লিখলে, সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর বিষয়ে লেখা শেষ হবে না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে (Astronomy) জ্যোতিপদার্থবিদগণ বিশ্বজগতের সৃষ্টির ব্যাপারে যে মতবাদটা দিয়েছেন তা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ-ব্যাং থিওরি (Big Bang Theory) নামে পরিচিত। বিগ-ব্যাং

থিওরি অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজগত প্রাথমিক বা আদি অবস্থায় একটি বিশাল পিণ্ড আকারে বিদ্যমান ছিল। এরপর সেখানে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটার ফলে বিভিন্ন কণাগুলো পৃথক হয়ে গঠিত হয় অসংখ্য ছায়াপথ (Galaxies)। অতঃপর এগুলো বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহপুঞ্জ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ ১৪০০ বছর আগে আল কোরানে সূরা আম্বিয়াতে বলেছেন "যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (একক সৃষ্টি হিসেবে) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, এরপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিলাম?"

আমরা যে গ্রহে বসবাস করি সেটার নাম পৃথিবী (ব্যাস ১২,৭৩৫ কি.মি.) যার নিকটবর্তী (গড়ে দূরত্ব ১৫০০০০০০০ কি.মি.) প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র হল সূর্য (ব্যাস প্রায় ১৪০০০০০ কি.মি.)। আমাদের এই সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা আটটি যেগুলি সূর্যের চারদিকে অনবরত প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই গ্রহগুলোরও বিভিন্ন উপগ্রহ আছে যেমন পৃথিবীর একটি উপগ্রহ হল চাঁদ (ব্রাস হল - ৩,৪৭৪ কি.মি.)। এবার আমাদের সৌরজগতের বাইরে গেলে দেখা যাবে সূর্যের মতো এরকম কোটি কোটি নক্ষত্র আছে তাদের সাইজ সূর্যের চেয়ে কোটি কোটি গুন বড় এবং সূর্য থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আলো এক সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কি.মি. বেগে ১ বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোকবর্ষ বলে। তাহলে অনুমান করতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে এক আলোকবর্ষ দূরত্ব কি বিশাল! তাই না?

রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করতে থাকা তারাগুলো আমাদের সূর্যের মতই অন্য কোন নক্ষত্র। তাদেরকে ঘিরে এমন অনেক গ্রহ মিলে তৈরি করেছে আরও অসংখ্য সৌরজগত। সূর্য বাদে আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র হল আলফা সেন্টোরি যা কিনা ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এরকম আরো অসংখ্য নক্ষত্র আর সৌরজগত মিলে তৈরি হয় বিশালাকার ছায়াপথ (Galaxy)। আমাদের ছায়াপথের নাম মিল্কিওয়ে যেখানে আমাদের সূর্যের মত ১০ হাজার কোটিরও বেশী নক্ষত্রপুঞ্জ অবস্থিত। আমাদের মিল্কিওয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব ১ লক্ষ আলোকবর্ষ! কিন্তু এই গ্যালাক্সিও বিশালতার দিক থেকে কিছুই না, যদি এর বাইরের জগত কতটা বিস্তৃত তা চিন্তা করা হয়। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির নিকটবর্তী গ্যালাক্সির নাম অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি যা আকারে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির প্রায় দ্বিগুণ বড় এবং মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে অর্থাৎ অ্যাণ্ডোমেডা গ্যালাক্সি থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় ২৫ লক্ষ বছর সময় লাগে। এইরকম ২ ট্রিলিয়ন বা ২,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যকেরও বেশি গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত আমাদের এই মহাবিশ্ব বা দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড (Obvervable

Universe) যার আকার ৯৩০০ কোটি আলোকবর্ষ। তাহলে পুরো মহাবিশ্বে সূর্যর মত কতগুলো নক্ষত্র আছে তা একটু ভাবার চেষ্টা করুন- পৃথিবীতে যত বালুকণা আছে তার চাইতেও বেশী। আজ পর্যন্ত অস্ট্রোনমিতে যা কিছু আবিস্কৃত হয়েছে তা সব অবজারভেবল ইউনিভার্সের মধ্যেই রয়েছে। অবজারভেবল ইউনিভার্সের কিনারাকে (edge) বলা হয় পার্টিকল হরাইজন (particle horizon) এর বাইরে যা কিছু আছে তা কখনোই জানা সম্ভব নয় কারণ পার্টিকল হরাইজন ছাড়িয়ে গেলে প্রত্যেক অবজেক্ট আলোর থেকে বেশি বেগে আমাদের থেকে ক্রমশ আরো দূরে সরে যাচ্ছে। তাই মানব সভ্যতা যদি চিরস্থায়ীও হয় তাহলেও এর বাইরে অকল্পনীয় সংখ্যক এমন আনেক স্থান থাকবে যা সম্পর্কে জানা তো দূরের ব্যাপার কল্পনা করতে পারার মতও কোন সম্ভাবনাই নেই শুধু নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকুন এর পর কি আছে...?

এই মহাবিশ্বকে যদি একটা ফুটবল হিসাবে কল্পনা করা হয় তাহলে এই ফুটবলের ভিতরে একটা সরিষার দানা রেখে দিলে যতটা জায়গা দখল করবে তার চেয়েও খুবই ক্ষুদ্র একটা জায়গা জুড়ে থাকবে আমাদের এই পৃথিবী। আমরা যা দেখতে পারছি বা ভাবতে পারছি তা এই ফুটবল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এই ফুটবলের বাইরে অনন্ত অসীম অন্য যা কিছু আছে তা আমরা কখনও জানতেও পারবো না।

মহান আল্লাহ মানুষকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নিউটনের শেষ কথা ছিল, আমি কতটুকু কি করতে পেরেছি জানি না কিন্তু পৃথিবীর এই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের জানার ক্ষেত্রে আমি সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা এক শিশুর মত, যে শুধু সারাজীবন নুড়িই কুড়িয়ে গেল। সমুদ্রের জলরাশির মত বিশাল এই জ্ঞান আমার অজানাই থেকে গেল"। জগৎখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "আমি একটি বিষয় জানি যে, আমি কিছুই জানি না"। বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত এই বিশাল সৃষ্টির এবং সৃষ্টি জগতের রহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত সেই সৃষ্টির কোন স্রষ্টা থাকবে না একথা বলা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে। এই বিশাল সৃষ্টি, এই অনন্ত অসীম মহাবিশ্বের বিশালতার কতটুকু আমরা জ্ঞাত তা চিন্তা করলেই স্রষ্টার নিকট শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে আসে। এই অনন্ত অসীম মহাবিশ্ব, এই বিশাল সৃষ্টির পেছনে একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন যিনি সবকিছুই নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন।

শ্রবনশক্তির ক্ষেত্রেও মানুষের রয়েছে সীমাবদ্ধতা, কারণ আমাদের কান সব শব্দ শুনতে পায় না। সেই সব শব্দই আমরা শুনতে পাই যে সব শব্দ তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনের পরিমাণে) ২০ থেকে ২০,০০০ এর মধ্যে থাকে অর্থাৎ মানুষের শ্রবণসীমা (hearing range) ২০ হার্জ (Hz)

থেকে ২০,০০০ হার্জ কম্পাংক পর্যন্ত বিস্তৃত এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। যেমন বাদুড়ের ডাক আমরা শুনতে পাই না। রাতে পেয়ারা বা লিচু গাছে আক্রমণ করলে হয়তো বাদুড়ের কিচিরমিচির শব্দ শোনা যায়। কিন্তু সেটা ওদের পথ চলার শব্দ নয়, ওটা ওদের সাধারণ ডাক। পথচলা ও খাদ্য খোঁজার জন্য বাদুড় ইনফ্রাসনিক কিংবা আল্ট্রাসনিক শব্দ ব্যবহার করে যা ২০,০০০ হার্জ এর বেশী। এসব শব্দ আমাদের কান ধরতে পারে না।

গাণিতিক বিষয় বিচার্যের ক্ষেত্রে মাত্রা বা ডাইমেনশন (dimension) কথাটা সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি পরিচিত। নির্দিষ্ট কোন কিছুর সাপেক্ষে কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করার জন্য ইউক্লিডীর জ্যামিতির ১-ডাইমেনশন, ২-ডাইমেনশন,৩-ডাইমেনশন ও n-ডাইমেনশন এর ধারণা উপস্থাপন করা হয়। প্রায়ই বলে থাকি আমরা থ্রী-ডাইমেনশনাল স্পেসে (এখানে স্পেস অর্থে ভৌত স্থান, physical space) বসবাস করি। কিন্তু এই ডাইমেনশন জিনিসটা আসলে কি? ডাইমেনশন কিসেরই বা হয়? কিভাবেই বা আমরা ডাইমেনশন নির্ণয় করি? সেবিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া যাক। অঙ্ক নিয়ে কখনো নাড়াচাড়া না করা মানুষও খুব সহজেই বলতে পারবে যে, মেঝেতে সমান করে পেতে রাখা একটা কাগজের ওপরের তলটা টু-ডাইমেনশনাল। মেঝের ক্ষেত্রেও একই কথা, টেবিলের ওপরের তলটাও তাই, আবার ঘরের দেওয়ালগুলোও একই। কিন্তু ঘরটা নিজে থ্রী-ডাইমেনশনাল। অন্যদিকে কাগজে আঁকা একটা রেখা অথবা একটা সুতোকে ওয়ান-ডাইমেনশনাল বলে ভাবা যায়। (যদিও আসলে সুতোটা থ্রী-ডাইমেনশনাল)। যত সরু সুতোই হোক না কেন তার প্রস্থচ্ছেদের একটা ক্ষেত্রফল আছে। কিন্তু সুতোটার দৈর্ঘের তুলনায় তা খুবই কম। একইভাবে খুবই সরু করে কাটা পেন্সিলে রেখা আঁকলেও সেই রেখার একটা বেধ আছে, তাই রেখা টু-ডাইমেনশনাল, যদিও বেধটা খুবই কম।)

এখন বাস্তবে যদি ওয়ান-ডাইমেনশনাল কোন প্রাণীর অস্তিত্ব থাকত তাহলে সে কিন্তু ওয়ান-ডাইমেনশনে একটা সরল রেখা বরাবর বিচরণ করত, সে কখনও অনুভব করতে পারতনা যে রেখার বাইরে অর্থাৎ টু-ডাইমেনশনাল বা থ্রী-ডাইমেনশনাল কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে। সে শুধু সরল রেখার উপর কোন কিছু থাকলে সেটাকে দেখতে পেত।

আবার বাস্তবে যদি টু-ডাইমেনশনাল কোন প্রাণীর অস্তিত্ব থাকত তাহলে তার বিচরণ ক্ষেত্র কেবলমাত্র সমতল হত। যেমন কোন কিছুর ছায়া (shadow) টু-ডাইমেনশনাল। এখন ছায়ার যদি প্রাণ থাকত তাহলে সে কিন্তু সমতলে যা কিছু আছে সব দেখতে পেত কিন্তু সমতল থেকে কিছু উপরে কোন কিছু থাকলে সেটাকে দেখতে পেত না অর্থাৎ থ্রী-ডাইমেনশনাল কোন কিছু দেখতে পেত না। যেহেতু তার দেখার সীমাবদ্ধতা টু-ডাইমেনশনাল ক্ষেত্রের উপর আবদ্ধ তাই

সে কেবলমাত্র ওয়ান-ডাইমেনশনাল এবং টু-ডাইমেনশনাল স্পেসের সবকিছু দেখতে পাবে এককথায় তার নিজের ডাইমেনশন বা তার থেকে কম ডাইমেনশনাল স্পেসের সবকিছুই দেখতে পাবে।

এবার আসা যাক থ্রী-ডাইমেনশনাল স্পেসের ক্ষেত্রে। বাস্তবে যত ঘনবস্তু অর্থাৎ মানুষ, পশুপাখি, ঘরবাড়ি, বইখাতা আছে সবই থ্রী-ডাইমেনশনাল অর্থাৎ এদের সবকিছুরই তিনটে মাত্রা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা) আছে। আমাদের অবস্থান যেহেতু থ্রী-ডাইমেনশনাল তাই আমরা থ্রী-ডাইমেনশনাল সবকিছু দেখতে পায় এবং সেই সঙ্গে তিন এর চেয়ে কম ডাইমেনশনযুক্ত (ওয়ান-ডাইমেনশনাল বা টু ডাইমেনশনাল) যা কিছু আছে সবই দেখতে পায়। যেহেতু আমাদের বিচরণ ক্ষেত্র বা দেখার সীমাবদ্ধতা থ্রী-ডাইমেনশনাল পর্যন্তই তাই আমরা তিনের অধিক ডাইমেনশনের কোনো কিছুরই জ্যামিতিক আকার কেমন হবে সে বিষয়ে কল্পনা করতে পারিনা, আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণে। অথচ বহুমাত্রিক গাণিতিক ক্যালকুলেশন কাজে লাগিয়ে আমরা বাস্তবে অনেক গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে থাকি। শুধু আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণে মাল্টি-ডাইমেনশনাল (তিনের আধিক মাত্রা) কোনো কিছুই দেখতে পাই না। তবে আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণে মাল্টি-ডাইমেনশনাল (তিনের অধিক মাত্রা) কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছিনা মানে মাল্টি-ডাইমেনশনাল কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই সেই ধারণ করাটা মূর্খামি। মাল্টি-ডাইমেনশনাল এমন কেউ (আল্লাহ) আছেন যিনি তাঁর চেয়ে নিম্ন-ডাইমেনশনের সবকিছু দেখতে পান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আমরা তাঁকে দেখতে পাইনা আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণে। কারণ আল্লাহ আমাদের সেই সীমাবদ্ধতা দিয়ে তৈরি করেছেন। পবিত্র কোরানে সূরা আন-আমে আল্লাহ নিজের অদৃশ্যময়তা সম্পর্কে বলেছেন, "কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল" (6:103)

পরিশেষে বলা যায় বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বাড়বে মানুষের পক্ষে কোরআন বুঝতে পারা আরও সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং কোরআনের এই সব নিদর্শন নিয়ে মানুষ যদি নিত্য চিন্তাভাবনা, জ্ঞান-গবেষণা করে তাহলে তারা অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, কল্পনাশক্তি ইত্যাদির সমূহ সীমাবদ্ধতার কথা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে এবং এই উপলব্ধি তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতে সাহায্য করবে।

ধর্মবিজ্ঞান কি ও কেন?

- নাসীর আহমদ

ধর্মবিজ্ঞান নিয়ে আজকাল আলোচনা খুব কম হয়। প্রায় হয় না বললেই চলে। সেজন্য ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ লোকের তো বটেই এমনকি পন্ডিতদের জ্ঞানও খুব ভাসা ভাসা। তাই প্রায় লোককেই বলতে শোনা যায় সব ধর্মই সমান। মনে হয় ইনি যেন সব ধর্ম জেনে বসে আছেন অথচ ভদ্রলোক কোন ধর্মই জানেনা। এসব বালসুলভ কথা। এ উদারতা নয়, অজ্ঞতা। এ পান্ডিত্য নয়, মূর্খতা।

কাল মার্কস যিনি নাস্তিক ছিলেন এবং ধর্মকে আফিম বলতেন তিনিও সব ধর্মকে সমান বলতেন না। জনৈক পণ্ডিত মূর্খ এক আলোচনা সভায় বলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভবের আগে সব ধর্মই মানবতার উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে। কাল মার্কস উঠে দঁাড়ান। তিনি বলেন তিনটি বিশ্বধর্ম যেমন বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্ম মানবতার উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে। হিন্দু ধর্ম মানবতার উন্নয়নের জন্য কোন কাজ করেনি। হিন্দু ধর্ম মানবতার উন্নয়নের জন্য কোন কাজতো করেইনি বরং সহজাত মানবতাকেও ধ্বংস করেছে। সচল মানুষকে অচল বৃক্ষের পূজা করিয়ে তার মনকে গতিশূন্য করে প্রস্তরীভূত করে তুলেছে। জ্ঞানবান মানুষকে অবলা গাইগরুর অধীন করেছে। ফলে তাকে চিরদিন পরপদানত থাকতে হয়েছে। তার গরু, জরু, ধান সবই গেছে। দুর্ভাগ্য তার নিয়তি। অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া তার মজ্জাগত হয়ে গেছে। তার কর্মশক্তি ধ্বংস হয়েছে। সে ভালো ও মন্দের মধ্যে কোন ফারাক করতে পারেনি। তার কাছে ভাল মন্দের বাছাই করার কোন কষ্টিপাথর নেই। নেই কোন মানদণ্ড।

হিন্দু ধর্ম বলে কোন ধর্ম নেই। সত্যধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে এ পড়েনা। এজন্য হিন্দু ধর্মের প্রধান ব্যক্তিরা একে একটা সংস্কৃতি আখ্যা দেন। এটা পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। এটা সনাতন। তাই একে মানতে হবে। এটা গাজোয়ারী ছাড়া কিছু নয়। Might is right জোর যার মুলুক তার। জ্ঞানীব্যাক্তিরা একথা মানতে চায় না। তারা ইবরাহিমী ধর্মকেই প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করেন। রাষ্ট্রসংঘও এই ত্রিধর্মকে অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। ৫ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রসংঘের জেনেভা সম্মেলনে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ধর্মসহ সকল ধর্মকে রক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলেছেন।

ইবরাহিমী ধর্ম হলো বিশ্বের তিন (ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম) ধর্মের জনক। তিনি বৌদ্ধ ধর্মেরও জনক। তিনি ব্রাহ্মধর্মেরও জনক, কিন্তু তিনি বৈদিক আর্য ধর্মের সূর্য-চন্দ্র পূজারীদের বিরোধী ছিলেন, বৌদ্ধধর্মে

মূর্তিপূজা ছিলনা, বুদ্ধপূজা ছিল না। এই বৌদ্ধদের হিন্দুরা ভারত ছাড়া করেছে। আজ খৃষ্টান ও মুসলমানদের ভারত ছাড়া করতে চায়। জালেম ও মজলুমকে কিভাবে সমানাধিকার দেওয়া যায় তা দেখার বিষয়। শিখ ধর্মের প্রতি বৈদিক আর্য হিন্দুধর্মের সাম্প্রতিক আচরণ, দিল্লীর দাঙ্গা, স্বর্ণমন্দির আক্রমণ প্রভৃতি তো সারা বিশ্বের জানা। আর্য ধর্ম প্রভাবিত বৌদ্ধধর্ম আজ মায়ানমারে কি ধংসাত্মক ভূমিকায় রয়েছে তাও কারও অবিদিত নয়।

বাঁচার অধিকার সবারই আছে সে যদি ধর্মহীন, নাস্তিক, খোদাদ্রোহীও হয়। ইবরাহিমী ধর্মেও সকলের সুরক্ষার বিধান বর্তমান, সদ্ধর্ম মানুষের প্রতি মানুষের বৈরিতা পছন্দ করে না। মযহাব নেহি শিখাতা হ্যায় আপোসমে বৈর রাখনা কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এখন ধর্মে ধর্মে হানাহানি বিদ্যমান। বৌদ্ধধর্ম একদিন সারাবিশ্বে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিল। খৃষ্টানধর্মও একাজ কিছুটা করেছিল। তারপর সেও ব্যর্থ হলো। ইসলামও সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব পয়দা করেছিল। তথাকথিত মুসলমানরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে গলা কাটাকাটি করলেও অমুসলমানদের রক্ষার গ্যারান্টির ব্যাপারটির প্রতি যত্নবান হয়েছে। আজ বাংলাদেশ হিন্দুদের, বৌদ্ধ ও শিখদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেছে। যা করার দরকার তার থেকেও বেশী করেছে। আরবদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখদের কোন সমস্যা নেই।

প্রকৃত ব্রহ্মধর্ম ভারতে, জগতে স্থাপন করতে পারে কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণরা তো ব্রহ্মাকেই ভুলে গেছে। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাকে এক করে বসে আছে। উপাসক ও উপাস্যকে এক করে ফেলেছে। এখন 'ব্রহ্মর' সাথে গরুকেও বসিয়ে দিয়েছে। স্বধর্ম ও সদ্ধর্মকে এক করে ফেলেছে। এখন প্রকৃত ইবরাহিম বা ব্রহ্মা হলো মোহাম্মদ (দঃ) রামাই পন্ডিতও এটা মেনে নিয়েছেন।

'ব্রহ্মা হৈল মুহাম্মদ,
বিষ্ণু হৈল পেগম্বর
আদম হৈল শূলপাণি'।

এখন কেতাবের ভারবাহী গাধা, শাস্ত্রের ভারবাহী গাধারাও এসব কিছু অনুধাবন করতে অক্ষম কারণ পৃথিবী থেকে ধর্মের চর্চাই উঠে গেছে। এখন সকলে মনগড়া ধর্ম, মনগড়া আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রীয় চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত আছে। মানুষ তো পশুপূজা করে পশুরও অধম হয়ে গেছে। অনেকেই পশু, পশুপতি ও পশুপতিনাথ হয়েগেছে। পশুপতির মন্দিরে গিয়ে পূজো করে আসছে। সিংহাসনেও সিংহমূর্তি। নারীর হাতেও অস্ত্র নরসংহারের জন্য। যোগীর কাছেও অস্ত্র, সন্ন্যাসীর হাতেও ত্রিশূল। গুলজারীলাল নন্দকেও ন্যাংটো সাধুরা তাড়া করেছিল। শান্তি এত সহজ ব্যাপার নয়। তাই নজরুল ইসলাম বলেছিলেন -

"প্রেম ও শান্তি বহু উর্ধের কথা দাদা
কহে পবিত্র শান্তির কথা যার সারাগায়ে কাদা"।

বামুনজাদা ইকবাল বলে গেছেন,'তেহরান যেদিন জেনেভা হবে বিশ্বে সেদিন শান্তি আসবে। পরবর্তী অংশ ২৭ পাতায়

সাবান থেকে রমযান

- আবিরা বেগম

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন শাবান আমার মাস আর রমযান আল্লার মাস। শাবান মাসে রসূল যা করতেন তা হলো বেশী বেশী করে নফল রোজা রাখা ও অতিরিক্তভাবে আল্লার রাস্তায় খরচ করা। তাঁর রোজা আমাদের মতো উপবাস ছিলনা। তাঁর রোজা ছিল পবিত্রতা ও সংযম। পবিত্রতা ও সংযম আত্মশক্তি দান করে। এই আধ্যাত্মিকতা প্রগতি আনে।

পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র পয়সা দান করলে তাতে বরকত হয় এবং সমাজে প্রাচুর্য আসে। রসূলুল্লাহ (দঃ) যা করতেন সাহাবারা তা চোখ বুজে দেখতেন না বরং তাঁরা তা করতে লেগে যেতেন। ফলে অচল সমাজ সচল হয়ে উঠতো। তাহাজ্জুদ ছিল রসূলের জন্য নফল কিন্তু যেহেতু রসূল পড়তেন সেহেতু তাঁরা পড়তে লেগে যেতেন। এমনি ছিল তাঁদের রসূল প্রীতি। এজন্য রসূল (দঃ) বলতেন আমার সাহাবীদের নিন্দা করোনা তাঁরা এক একজন এক নক্ষত্র সদৃশ। তাঁরা সকলেই অনুসরণ যোগ্য ব্যক্তিত্ব কিন্তু তৎ সত্বেও রসূল হলেন মানদণ্ড। অন্যরা মানদণ্ড হবেন না।

রসূল (দঃ) ভাবতেন তিনি এমন কাজ করবেন না যা উম্মতের জন্য কষ্টকর হয়। তাতে উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তিনি জানতেন। তিনি সহজতা পয়দা করতে এসেছেন, কাঠিন্য পয়দা করতে আসেননি। কাঠিন্যের ফলে সংগঠন বা জামাত নষ্ট হয়। শুধু জামাত নয়, ব্যক্তিও নষ্ট হয়। সে জন্য তিনি তিন দিন রমজানে জামাতবদ্ধভাবে তারাবী পড়ে চতুর্থদিনে এলেন না কেননা এর ফলে উম্মত একে ফরজ করে নেবে এবং শেষ পর্যন্ত তা পালন করতেও পারবেনা। তাঁর এ ঔচিত্যবোধ উম্মতকে ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা করেছে।

এই সতর্ক বুদ্ধির কারণে তিনি ১৫ই সাবানের পর নফল রোজা পালনকে নিষিদ্ধ করে গেছেন। সাবানে তাঁর রোজা রাখার কারণ হলো রমযানের রোজার প্রস্তুতি। এটা যদি সবেবরাতের পরেও জারী রাখা হয় তাহলে রমযানের রোজা রাখা কষ্টদায়ক হবে অথচ সেটা ফরজ।

এজন্য তিনি ২৪ ঘন্টা রোজা রাখতেন না। তিনি রোজা রাখতেন এবং ইফতার করে রোজা ভাঙতেন। আবার রাত্রে স্ত্রী সহবাসও করতেন আবার সেহেরী খেয়ে রোজা রাখতেন। তিনি ভারসাম্যহীনতার শিকার ছিলেন না। কিন্তু ধর্মান্ধলোকেরা এই সীমালংঘন করে প্রান্তিকতার শিকার হয়। মধ্যম পন্থা পরিহার করে নিরম্বু উপবাস করে অতিসাধু হতে যেয়ে বেতাল পঞ্চবিংশতী হয়ে যায়।

এই বাড়াবাড়ি বা প্রান্তিকতার কারণে অত্যাধিক কৃচ্ছসাধনার ফলে জৈন্যধর্ম বিশ্বধর্ম

হতে পারলো না। গণধর্ম হতে পারলোনা। বৌদ্ধধর্ম ভারসাম্যতা অবলম্বন করেছিল বলে জনগনের ধর্ম হয়ে গেল। ব্রহ্মণ্যধর্মও আতিশয্যতার পথ অবলম্বন করেছিল। তাদের আতিশায্যে প্রভাবিত হয়ে বৌদ্ধরাও বুদ্ধপূজা করে বসলো। ফলে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হলো। দান করতে হবে বলে পোঁদের কাপড় খুলেও দান করতে হবে? হর্ষবর্ধন একাজ করে লোক হাসালেন। শশাংক বোধিবৃক্ষ ছেদন করে ফেললেন। বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেল। আম্বেদকরের কারণে বৌদ্ধধর্ম আজ হিন্দুধর্মের শাখাধর্ম। এজন্য আজও বুদ্ধগয়ার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। পুরী ও অন্যান্য বৌদ্ধ কেন্দ্র ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দখলে।

বেদাতী হওয়ার কারণে মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দস হারা। বাবরী মসজিদ হারা, মাযার পূজার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। মাযারগুলো বেদাতীদের হাতে শের্কের আড্ডাখানা। আল্লামা ইকবাল দুঃখ করে বলেছিলেন,

"মাদরাসা আর খানকা হতে ক্ষুন্নমনে ফিরছি আমি
বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কণ্ঠ চাপি মারছে তোমায়
লা-ইলাহার আওয়াজ তাইতো আজি নাহি শোনা যায়।

রমযান হলো আল্লার মাস। আল্লাপাক যা পছন্দ করেন তা হলো ঐশীপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লার রাহে জেহাদ ও কোরবানী করা। এ জেহাদ হলো সাত্ত্বিকের জেহাদ। এতে রোজা ভঙ্গ করে জেহাদে যেতে হয়। বদরের যুদ্ধে রসূল জাহেলদের মোকাবেলায় রমযান মাসে জেহাদে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন। তিনি এ যুদ্ধে জয়ের জন্য তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের সাহায্য নিয়েছিলেন। তিনি সালাত ও সবরকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আল্লাপাক তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি বিজয়ী বেশে ফিরে এসেছিলেন। ফিরে এসে শোকরিয়া স্বরূপ ঈদের নামাজ পড়েছিলেন রমযান মাসেই। এবছরে মহানবী (দঃ) দুবার ঈদের নামাজ পড়েছিলেন।

রমযান হলো বিজয়ের মাস। রমযান মাসে যুদ্ধে জেহাদে মুসলমানরা কখনও পরাজিত হয়নি।

রমযান মাসে থাকে শবেকদর বা ভাগ্যরজনী। তকদীর বা ভাগ্যকে বুলন্দ করার জন্য প্রদান করা হয় ঐশী কেতাব। এই মাসেই নাযিল হয়েছিল তওরাত, যব্বুর ও ইনজীল এবং সেই সঙ্গে আলকেতাব কোরান মজীদ ও ফোরকান।

বরাত গঠনের কাজ শুরু হয় সাবান মাসে আর শেষ হয় রমযান মাসে। রমযান পরাজিত জনদের বিজয়ের মাস। রমযানের পর এসেছিল শওয়ালের ঈদ। তিনি প্রচলন করেছিলেন ফেতরার ঈদ। এতে মেয়েরা যারা সোনা ভালবাসে তারা গায়ের সোনা খুলে দিয়েছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর এতিম ও বিধবাদের জন্য। ফলে উম্মতের নবজন্ম হয়েছিল। এই ঈদ পূর্ণতা লাভ করেছিল বকরীদের ঈদে মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে। এছিল এক রক্ত পাতহীন গৌরবময় বিপ্লব। এধরনের বিপ্লব আসবে খোরাসান থেকে। এরা খরোষ্ঠী গোষ্ঠীর লোক।

আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন তিনি ফারসী ভাষার মাধ্যমে কাব্য কবিতা লিখে এ বিপ্লবের বাণীকে সমরখন্দ ও বোখারা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এই অঞ্চলে অর্থডকস্ খৃষ্টান বা মৌলবাদী খৃষ্টানদের বাস যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করেনা। ইহুদীরা এখান থেকে পালিয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের পর। জায়নবাদীরা আর এখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। আগামী রমযানই বলে দেবে কোথাকার পানি কোথা গিয়ে দাঁড়াবে। এই চেচেন- খোরাসানীদের মধ্যে শামস তবরীজ ও জামালুদ্দিন রুমীর মস্তিষ্ক কাজ করছে। ইস্তামবুলে বা কৃষ্ণসাগরে, ককেশাসে যে নবজাগরর্নের জোয়ার আসবে তা মক্কা-মদিনা ভেদ করে সিরিয়ায় এসে যাবে। কানা দাজ্জাল এখানে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে কিন্তু হযরত ঈশার (আঃ) আগমনের কারণে শেষরক্ষা করতে পারবে না। বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে আসবে। এর প্রভাব পড়বে সারা দুনিয়ার উপর Clash of civilisation বা সভ্যতার সংঘাতের যে আগুন জায়নবাদীরা জ্বালিয়েছিল তা নিভে যাবে। পৃথিবীতে শান্তির রাজত্ব স্থাপিত হবে। পোপ-পাদরী-পুরোহিত ও মোল্লাতন্ত্রের অবসান হবে ইনশাআল্লাহ।

ধর্মবিজ্ঞানের অংশ

সেখানের রাষ্ট্রপতিও ইবরাহিম। কাবা যখন ইবরাহিমদের দখলে আসবে সেদিন বিশ্বে শান্তি আসবে।

প্রকৃত ইবরাহিম ইহুদী ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না, মোশরেক বা মূর্তিপূজকও ছিল না। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। একমেবাদ্বিতীয়ম ছাড়া শান্তি আসবেনা। আদি ধর্ম গ্রন্থ সমূহে, ব্রহ্মার ফরমান সমূহে, মুসার ফরমানে, ঈশার (আঃ) ইনজীলে, মহম্মাদের (দঃ) কোরানে সেই একই সত্য বিদ্যমান। এঁরা হলেন কষ্টিপাথর। কোরান ও ফোরকান হাতে যারাই উঠবে তারাই সফল হবে। লৌকিক ধর্মে, লোকাল ধর্মে, লৌকিক রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রসংঘেও এর সমাধান নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হারিয়ে মানুষ আজ দিশেহারা। রুটি, কাপড় মাকান নিয়ে লোকেরা আজ পাগলপারা। এক কবিয়াল গাইতেন তুই তো সেই ভাগলপুরের গবীনগাই, মাও পাগল, বাবাও পাগল, পাগল এদের ভগ্নী ভাই, আমি কোন পাগলের মন যোগাই।

জালেমদের রাজত্বের অংশ

বুকে এমন কাজ করছো যা দেখে আমাদের লজ্জা পাচ্ছে। এই নির্বোধদের জন্য কেয়ামত আসবে। তারা নিজেদের উপর নিজেরা এতটা জুলুম করবে। তাদের অনেক রস হবে। তারা রাসের মেলা করবে। রসের বিনোদিনী হবে। তারা রসাতলে যাবে। তারা স্বর্গেও যাবে না, মর্তেও থাকবে না তারা পাতালে গো-কুলে যাবে। আর সেখানে দেখবে গোকুল অন্ধকার। এই গোকুল হলো জাহান্নাম যেখানে গরুর অধমরা থাকবে।

আধুনিক জাহেলিয়াত থেকে সাবধান

- প্রভাকর গুপ্ত

আধুনিক জাহেলিয়াত আগেকার জামানার জাহেলিয়াতের মত নয়। সে যুগের আবুজেহেল আর এ যুগের আবুজেহেল এক নয়। এ যুগের জাহেলিয়াত বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াত। তা যেমন চকচকে তেমন ঝকঝকে। আধুনিক জাহেল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী চলে। সে চানক্যবুদ্ধির অধিকারী নাস্তিক। শাস্ত্রের ভারবাহী গাধা। সে নিজেকে 'আবুল হাকাম' মনে করে। আবুল হাকাম মানে হলো মাষ্টার মাইণ্ড। মক্কর-চক্কর করা তার কাজ। ছলকলা করা তার কাজ। ছলে বলে কলে কৌশলে তারা কাজ করে। ন্যায়কে তারা অন্যায়। অন্যায়কে তারা ন্যায় বানাবার ওস্তাদ। সব কিছুই ভাঁড়ু দত্তের কাজ। আধুনিক সভ্যতার মধ্যে যেটা নেই তা হলো সত্য ও সততা। এজন্য ব্রাহ্মণকে Bird বা ভাঁড় বলা হয়। সে কথার মাষ্টার যাদুর কেতাব তৈরী করেছে। যাদুর ফল ক্ষণস্থায়ী হয়। সত্য ও সততার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। শেয়ানের চাল শেষ পর্যন্ত ধুপলো বনে পড়ে যায়। চালাকি চালবাজি কোন কাজে আসে না। জাহেলরা শঠে শঠ্যাং সমচারেত নীতিতে বিশ্বাসী। শঠ আর সৎ প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ। কিন্তু অর্থের তফাৎ আকাশ পাতালের মতো। চোরাকে ধর্মের কাহিনী শোনান যায় না। চোর যখন ধার্মিক সাজে, সাধু সাজে, সন্ত সাজে, যখন সত্য মিথ্যা হয়ে যায় তখন বিপর্যয় অনিবার্য। তখন ফাসাদ সৃষ্টি হয়। ফ্যাসিজিম আত্মপ্রকাশ করে। বৈদিক মন্ত্র হলো চোর ও সাধু সমান। বিয়ে ও ব্যাভিচার সমান। বলা হয়। 'Marriage is nothing but a legal prostitution' অর্থাৎ বিয়ে আইন সম্মত ব্যাভিচার। বৈদিক সমাজে বিয়ে তাই কঠিন আর ব্যাভিচার খুব সহজ। ব্যাভিচার হলে ভ্রুণ হত্যা, শিশু হত্যা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এভাবে শিশুনিধন যজ্ঞ চলে। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী তাই বিপাকে পড়ে গেছেন। সংসদে, আদালতে এ নিয়ে পশ্ন উঠেছে। কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে পারছেনা। রাজ্যসভায় সুশীল কুমার মোদী বলেছেন বিবাহিত স্ত্রীর সাথে তার অমতে মিলিত হলে তাকে যদি ধর্ষণ বলা হয় তাহলে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিই তো শেষ হয়ে যাবে। এ রোগ সারাতে রোগীই শেষ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সরকারের অবস্থান কি তা মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর কাছে সাংসদ জানতে চান। মন্ত্রী মহোদয়াও বিব্রত। তিনি বলেন এ ব্যাপারে দিল্লী হাইকোর্টে কেস চলছে। বিষয়টি বিচারাধীন। সুতরাং তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে অক্ষম।

আদালত যখন জানতে চাইবে সরকারের অবস্থান কি তখন তো আর চুপ করে থাকা যাবে না।

রাজ্যে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ দিতে হবে। যে সব রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু তাদের সংরক্ষণ দিতে হবে এ হিন্দুদের দাবী। আদালতে মামলা এসেছে। আদালত কেন্দ্রের কাছে সংখ্যালঘু কারা তার তালিকা চেয়েছে। কেন্দ্র তা দিতে পারেনি। আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে জরিমানা করেছে। এ ব্যাপারে কি হয় তা দেখার বিষয়। বৈজ্ঞানিক ধর্ষণ ও তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। এ সব দুর্বহ বোঝা থেকে মানুষকে বাঁচাতে আল্লাহ পাক নবী পয়গম্বর পাঠিয়েছিলেন কিন্তু নবীকে বাদ দিয়ে যে সংবিধান রচিত হয়েছে তাতে এর সমাধান নেই। এজন্য রঞ্জনা রঞ্জিত কোরানের আইনকে ইউনিফর্ম সিভিলকোড হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য জোরদার আবেদন জানিয়েছেন। গো দেবতা ষাড় অথবা গাভীকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া তো কোন উপায় নেই। তারা কি এর সদুত্তর দিতে পারবে? গোসাল ও চার্বাকরা সবাই পড়বে বিপদে।

বউ যদি স্বামীর বিরুদ্ধে কেস করে সাক্ষী কোথায় পাওয়া যাবে? বার্টান্ড রাসেল এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ দার্শনিক। তিনি বলেছেন মা, বউ ও কন্যার মধ্যে কোন ফারাক নেই। উভয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় কোন দোষ নেই। মার্কসের মতও এ থেকে ভিন্ন নয়। রাম রহীমের দর্শন তো সকলের জানাই আছে। শুধু দর্শন নয়। আমলও আছে। মানুষ কোথায় যাবে? একটা উপায় আছে। সমকামিতায় ফিরে যাওয়া। ভারতে এখন এতবড় পাপও বৈধ। যা লুতের (আঃ) জামানায় ছিল। এ দেশ আসলে জাম্বু দ্বীপ। পাপের দ্বীপ। মনস্কামনার দেশ। মন কি বাতের দেশ। বাসনা, কামনা লালসার দেশ। ইরান যখন জাহেলিয়াতের দেশ ছিল তখন এক ইরানী সম্রাট নিজ কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মা প্রজাপতি নাকি তার মানসকন্যাকে সৃষ্টি করে তার উপর উপগত হয়েছিলেন। এখন মেয়েরা বিজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে পুরুষ হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ নারী হয়ে যাচ্ছে। দুঃশাসনরা দেশ চালাচ্ছে। তারা দুর্যোধনের মালিক। দুর্যোধন মানে হারাম মাল। এখন চৌকিদারও চোর। চোর চুপড়ায় দড় হন। আগে পুরুষ চোর হোত এখন নারীরাও পাকা চোর হয়েছে। এদের চুন্নী বলা হয়। ফারসীতে খানকী। বাংলায় ছিনাল। চৌরকর্মী ও যৌনকর্মীতে দেশ ছেয়ে গেছে। পৌরকর্মী পুরন্দর হয়ে যাচ্ছে। পুরোহিতরা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পুরন্দর হয়ে যাচ্ছে।

এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মহামনীষী জর্জ বার্নাড 'শ' পাশ্চাত্যের পুরুষদের মুসলিম জাহানের দিকে পালাতে বলেছেন। তিনি বলেছেন আমরা যে সুখশান্তি পেতে চাই তা সম্ভব হবে যদি আমরা মোহাম্মদের (দঃ) মতো একজন মানুষকে আধুনিক জগতের একমাত্র শাসক বানিয়ে দিতে পারি। হযরত মহম্মদকে (দঃ) সবচেয়ে বেশী ভয় চোর ও চুন্নীদের। ইসলাম ফোবিয়ার মূল রহস্য এখানে। ইসলাম হচ্ছে বিশ্বের নিয়তি আর নিয়তির কোন বিপর্যয় নেই।

জালেমদের রাজত্ব বেশীদিন টেকেনা

- নুরআমিন সিপাই

কংগ্রেস জালেম ছিল তাই তার রাজত্ব বেশীদিন টিকলোনা। বামপন্থীরা জলেম তাই তাদের রাজত্বও বেশীদিন টিকলোনা। সংঘ পরিবারের জালেমের রাজত্বও বেশীদিন টিকবেনা। কাল কাউকেও ক্ষমা করবেনা।

প্রেসিডেন্ট নাসের জালেম ছিল। তাই তার রাজত্বও বেশীদিন টিকলোনা। ইরানের শাহ জালেম ছিল তাই তার রাজত্ব শুধু নয় রাজতন্ত্রও খতম হয়ে গেল। এমনকি বংশে বাতি দিতেও কেউ রইলনা। প্রেসিডেন্ট আয়ূব খাঁন জালেম ছিল, জালেম ছিল মিঃ ভূট্টো ও শেখ মুজিবর। তাই তাদের পরিণতি ভালো হয়নি। তারা সকলেই কমবেশী দুনিয়ার কুত্তা ছিল। তাদের মধ্যে যা ছিলনা তা হলো সত্য ও সততা। গণতান্ত্রিক স্বৈর শাসকগুলির রাজত্বও অচিরে ফিনিশ হবে। গণতন্ত্রিক স্বৈরাচারী হাসিনার দিন, দিন দিন হীনবল হয়ে আসছে। গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার আমেরিকাও তার বংশধরদের বিপাকে ফেলেছে। তারা ইসলামাতংকে ভুগছে।

মুসলমান তো ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। মড়ার উপর খাড়ার ঘা না পড়লে সে কবেই শেষ হয়ে যেতো। তারা তাদের বিবির তালাক নিয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রের তাতে হাত দেবার কি দরকার ছিল? এই অশালীনতার যুগে হিজাব নিয়ে অবলা নারীদের টানাটানি করবার কি দরকার ছিল? একি ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা নয়?

আল্লাহ পাক দুর্বলের কান্না শোনেন। তাই অনন্যোপায় হয়ে মেয়েটি আল্লাহো আকবর বলে দাঁড়িয়ে গেল। সহসা আল্লাহর সাহায্য এসে গেল। জালেমরা যদি এ থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদের উপর খোদার মার এসে যাবে। খোদার মার দুনিয়ার বার। ইন্দিরাগান্ধী তার নিজের বডিগার্ডের দ্বারা নিহত হলেন। সঞ্জয় গান্ধী নিজের বিমান চালাতে গিয়ে নিজেই আকস্মিকভাবে নিহত হলেন। রাজীবগান্ধীও অকালে প্রাণ হারালেন। আজ সোনিয়া গান্ধী রাহুলের দল ছেড়ে দীর্ঘদিনের প্রবীণ কংগ্রেস সেবিরা হতাশ হয়ে বসে পড়লো। বিজেপি ছেড়ে যোগীর সাথে যোগ ছিন্ন করে চলে যাচেছ। দল বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার। পলকা ডালে বাসা বাঁধলে তা ক্ষনস্থায়ীই হয়। নৈতিকতা না থাকার জন্য বৃটিশ সিংহও নাজেহাল। অচিরেই তার গৌরব সূর্য ডুবে যাবে। কেননা বৃটিশরা ছিল Nation of Shopkeeper বা বেনেবুদ্ধির লোক। মুদিদের রাজত্ব, বেনেদের রাজত্ব বেশীদিন টেকেনা। খোদার বস্তী তো দোকান নয়। এ রবের মুলুক। খোদা ধন দিয়ে চিনে মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ?

চানক্য চন্দ্রগুপ্তের কাঁধে বন্ধুক রেখে নন্দবংশ ধ্বংস করেছিলেন। শুদ্র চন্দ্রগুপ্ত জৈন হয়ে মরলেন। তার ছেলে বিন্দুসার রাজা হলেন। তার মানে নামমাত্র শাসক হলেন। উপগুপ্তের হাতে বিন্দুসারের পুত্র অশোক বৌদ্ধ